

মৈত্রী সংযোগ সোসাইটি, কোচবিহার কর্তৃক
রূপান্তরকাম, যৌনতা ও অধিকার বিষয়ক উত্তরবঙ্গের প্রথম পত্রিকা উদ্যোগ

মৈত্রীবার্তা

প্রথম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | ২০১৫

কেন এই পত্রিকা

অরিন্দম দাস (ওরফে সুমি)

গুটি গুটি পায়ে পেরিয়ে এলাম বেশ কিছু বছর। অনেকদিন থেকেই আমরা ভাবছিলাম একটা পত্রিকা বের করার কথা, কিন্তু নানা কারণে সম্ভব হচ্ছিলো না। ভাবছিলাম সাহিত্য পত্রিকা তো শত শত বেরোয়। যারা সে-সব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত তাদের উদ্যম এই ধরনের সৃষ্টির খাতেই প্রবাহিত হতে চায়। ভালো-মন্দের দায় তাদের, কিন্তু উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু যৌনতা বা সমকামিতা নিয়ে লেখা অন্তত আমাদের অঞ্চলে বা জেলায় সেরকম ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি না। অবশ্য এখানে বলা ভালো যে আমি সমকামিতা না বলে বরং সমপ্রেম বলাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, কারণ আমাদের মত রূপান্তরকামী মানুষদের কাছে তো শুধু কাম বা শরীরটা সব নয়, বরং বলতে ইচ্ছে করে ‘শরীর যদি সব হবে তো মন কোথায় যাবে’। এই সব প্রসঙ্গে তো খুব একটা লেখালেখি হয় না, হয়ত অনেক লেখক লেখিকার এই প্রসঙ্গে লেখার ইচ্ছে থাকলেও নানা কারণে লিখতে পারে না। দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা হলেও আমাদের উত্তরবঙ্গে সে ভাবে খুব একটা সমপ্রেম এবং রূপান্তরকামিতা নিয়ে লেখালেখি চোখে পড়ে না।

মৈত্রীবার্তা কোনো সাহিত্যপত্রিকা নয়। মৈত্রীবার্তা এমন কিছু মানুষের অধিকারের কথা বলছে যারা আমাদের তথাকথিত সভ্য ভদ্র সমাজে একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় প্রতি মুহুর্তে মানুষের লাঞ্ছনা বঞ্চনা অপমানের শিকার হতে হয়। এই সকল মানুষদের আবার আমাদের সমাজ বেশ কিছু নাম ও ধার্য করে দিয়েছে - যেমন মেয়েলী, হাফ-লেডিস, বৌদি, গান্ডু, ছক্কা, আরও অনেক কিছু। এখন তো বিশেষ ভাবে প্রচলিত একটি নাম হচ্ছে হিজড়ে - যে কোনো মেয়েলী ছেলে দেখলেই তাদের যেন নাম হয়ে যায় হিজড়ে। যদিও আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না যে পুরুষালী হলে কি কি করতে হবে আর মেয়েলী হলে কি কি করতে হবে, বা কেন এক চিরন্তন বিধির মত এই পুরুষালি/মেয়েলির বিভাজন আমাদের মনে চলতে হবে। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই লিঙ্গবিভাজনের কারণে যারা বহিষ্কৃত বা প্রান্তিক হয়ে যান, এই সকল মানুষদের জীবনের ভাঙ্গা গড়া কিছু কথাই আমরা মৈত্রীবার্তা নামক পত্রিকাতে তুলে ধরেছি।

এইবার খুব ছোট করে দু-চারটি কথা না বললে আমাদের পাঠকেরা বুঝতে পারবেন না যে আমরা কেন এই রকম একটি বিষয়ের উপর পত্রিকা বের করার উদ্যোগ নিলাম। গত ২০০৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট জেলা কোচবিহারে মেয়েলী পুরুষ, পুরুষ থেকে নারী রূপান্তরকামী, এবং হিজড়ে জনগোষ্ঠীর মানুষদের সামাজিক অস্তিত্ব এবং অধিকার নিয়ে আমরা কাজ করে চলেছি। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জন্যে শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, এবং সমাজের সর্বস্তরে একজন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এর পাশাপাশি আমরা যৌনতা ও মানবাধিকার প্রসঙ্গে জনমত সৃষ্টি করার জন্যে কর্মশালা, গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী পালন করে থাকি। রূপান্তরকামী গোষ্ঠীর উপর ঘটে চলা প্রশাসনিক ও সামাজিক হিংসাত্মক ঘটনার মোকাবিলা করা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ। আমরা যখন এই কাজ শুরু করি তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের অধিকারের লড়াইয়ের রাস্তাটা যে খুব একটা মসৃণ ছিল, সেটা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ আমাদের কাজে বাধা দিয়েছে, কিন্তু আমরা কখনও হাল ছাড়িনি, বরং যতদূর সম্ভব শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছি। এই বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে আছে শহর এবং গ্রাম-এর বিভাজন। শহরকেন্দ্রিক, বড় বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত সংগঠনের ছোট সংগঠনদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা তো আমাদের প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করতে হয়। আমাদের সংগঠন তথাকথিত শহরকেন্দ্রিক সংগঠন নয় বলে এবং শহর কেন্দ্রিক সংগঠনের কর্মকর্তাদের মত হয়ত ইন্টারনেট সর্বক্ষণ ব্যবহার না করতে পারার ফলে আমাদের প্রচেষ্টা সেরকম প্রচার পায় না, এবং বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রকল্প থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়। কিন্তু আমরা সত্যি গর্বিত যে এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সংগঠনের ভিত্তি কখনো নরম হয়নি, যার কারণেই আমরা শত শত বাধা সত্ত্বেও আমাদের কাজ করেছি ও পরবর্তীতেও কাজ করে যাব। একটা কথা মনে পড়ে গেল - ছোটবেলা আমি যে স্কুলে পড়তাম সেখানে এক মাস্টারমশাই সব সময় বলতেন ভালোর সংখ্যাটা যদি ৫ জন হয়, তো খারাপের সংখ্যাটা ৫০০ হবে। কিন্তু সেই প্রতিকূলতার মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এই পত্রিকাটি সেই পথ চলার একটি ফলকপাথর। এই প্রথম আমরা এইরকম একটি পত্রিকা বের করার সাহস দেখালাম। আমরা আশা রাখব আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে আপনারা আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। সেই সব মানুষদের আমরা আহ্বান জানাই যারা লিঙ্গ পরিচয়, যৌন পছন্দ ও যৌনচাহিদার স্বীকৃতির জন্য বদ্ধপরিকর, যারা গরিব-বড়লোক, শহর-গ্রাম ইত্যাদি বিভাজন মানেন না, এবং ধর্ম, বর্ণ বা জাতীয়তা-ভিত্তিক বৈষম্যের বিরোধিতা করেন। যে সমস্ত মানুষ আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন, আমরা তাদের সবাইকে আমাদের পথ চলার সাথী হিসেবে স্বাগত জানাই।

প্রসঙ্গ হিজড়া বনাম যৌনতা

নজরুল মুখা

নাদিরা খানম বয়স আনুমানিক ৩২। বাবা সিরাজুল ইসলাম আদমজী জুট মিলে প্রডাকশন ম্যানেজার ছিলেন। দিনাজপুর শহরে তার জন্ম। ৪ ভাইবোনের মধ্যে বড় নাদিরা। জ্ঞান হওয় পর নিজেকে আবিষ্কার করে হিজড়া হিসেবে। পরিবার ও পরিজনদের অনাদরে অবহেলায় বুঝতে পারে সে আর দশজন সাধারণ মানুষ নন। অবজ্ঞার কারনে সে অন্য দশজন ছেলের মত চলতে ফিরতে পারে না। পদে পদে উপেক্ষা। তারপর ও শত প্রতিকূলতার মাঝে লেখাপড়া চালিয়ে যান নাদিরা। ১৯৯৯ সালে দিনাজপুর আদর্শ কলেজ থেকে মাস্টার্স পাস করেন। দু’ বছর হয় রংপুরে এসেছেন। রংপুরে এসেই সবসময় চিন্তা করেন কিভাবে হিজড়াদের উন্নয়ন করা যায়। সেতু বন্ধন হিজড়া উন্নয়ন সংস্থা নামে একটি সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পরেন। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাদিরা। সভাপতি হচ্ছেন হাবিবা। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২৬৫ জন। নিজস্ব আয়ে সংগঠন চলে। এইচআইভি ও হিজড়াদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করছেন। এই সংগঠনের সদস্যদের কারো মাথা গোজার ঠাই নেই। ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়। বাড়ি ভাড়া পেতেও বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাদের। হিজড়া বলে কেউ বাসা ভাড়া দিতে চায় না। জীবন ধারনের যে মৌলিক অধিকার আছে তা থেকে বঞ্চিত হিজড়া জনগোষ্ঠী। মানুষ হিসেবে চলা ফেরা করতে গেলেই সবস্থানেই উপহাসের পাত্র হতে হয়। হিজড়াদের সরকারী চাকরীর জন্য কোন কোটা নেই। বয়স্ক,প্রতিবন্ধ, বিধবা ভাতা থাকলেও হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কোন ভাতা নেই। ভোটাধীকার থাকলেও ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার নেই। পূর্নবাসনের কোন ব্যবস্থা নেই। অনেক হিজড়া পারিবারিক লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকে। পরিবারের অন্য সদস্যরা লজ্জা ও ভয়ে তাদের কথা প্রকাশ করেন না। নাদিরা জানায় একদিন একটি অটো রিক্সায় উঠলাম। আমার উঠা দেখে অনান্য যাত্রীরা নেমে পড়েন। কেউ তার সাথে যেতে চায় না। অফিস, আদালত , পথে ঘাটে সর্বত্রই এরা অবজ্ঞার পাত্র। একজন মানুষ হিসাবে কামনা বাসনা সবই রয়েছে হিজড়াদের। ধর্মীয় এবং আইননত সমকাম অপরাধ। কিন্তু হিজড়া কি সমকামি এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক মত পাওয়া যায় না। হিজড়াদের সেক্স করার বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই। অথচ তাদের সেক্স রয়েছে। তারাও রক্ত মাংসের মানুষ। তারা যদি কারোর সাথে মিলিত হয় তাহলে এটাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজ। অথচ হিজড়াও মানুষ। অন্য আর দশজন নারী পুরুষের মত তাদেরও সেক্স করার অধিকার রয়েছে। একথা সমাজ মানতে চায় না। বাংলাদেশের আইনে ৩৭৭ধারায় বলা হয়েছে প্রকৃতি বিরুদ্ধে যৌন কার্যকলাপের শাস্তি যাবজ্জীবন অথবা ১০ বছরের কারাদন্ড।

সমকামিতা এবং রূপান্তরকামীতা সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির অংশ। তথ্য মতে প্রতিটি দেশেই গড়পড়তা দশ ভাগের মতো এলজিবিটি লেসবিয়ান, (গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডার) সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। গবেষক দের মতে বাংলাদেশে সমকামীর সংখ্যা ৬০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ। এর উল্লখযোগ্য অশই হচ্ছে হিজড়া জনগোষ্ঠী। অথচ দেশে তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। দেশের তথাকথিত সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ পানি অধিকার, ভূমি অধিকার, নারী অধিকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পাহাড়ি কিংবা আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা দেখালেও তারা কখনো হিজড়াদের যৌনতার স্বাধীনতা কিংবা অধিকার নিয়ে একদমই কথা বলে না। প্রকাশ্যে কোনো কোনো এনজিও হিজড়া ইস্যু নিয়ে কাজ করলেও হিজড়াদের সমকামিতা কি দুষ্ট প্রবৃত্তি বলা যাবে। নাকি এটা প্রকৃত প্রদত্ত একটা অংশ। যদি প্রকৃতি প্রদত্ত হয়ে থাকে তা হলে তাদের সেক্সের কেন স্বীকৃতি নেই। এ বিষয়ে সরকার থেকে আরম্ভ করে আম জনতা পর্যন্ত নির্বিকার। ব্রিটিশ আমলে ১৮৬০ সালের পেনাল কোডের আইনের ৩৭৭ ধারায় প্রকৃতি বিরুদ্ধে যৌন কার্যকলাপ বলতে তারা কি বোঝাতে চেয়েছে এটাও পরিষ্কার নয়। সমকামীরা তো দাবী করছেন, তারা প্রকৃতি বিরুদ্ধ না। তাদের রুচি পছন্দ ও প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতির এই হিসেব কে মেনে নিতে না পারলে তাদের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছে এই বোধ আমাদের মাঝে জাগ্রত করতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সাংবিধানিক অধিকার। হিজড়ারা তাদের পছন্দমতো জীবন যাপন করবে এটা সবাইকে মেনে নেওয়া উচিত। আর পাঁচজন মানুষের মতো

নারী তুমি কাঁদো

শুভজ্যোতি বর্মন

পুরুষ কি, জানি না। জানি শুধু তোমায়
নাঃ তুমি ধষণ তো কখনও করনি আমায়।
ক্লাস ওয়ান তুমি আর তোমার যৌনি টেপা হাতে
উল্টো করা পৃথিবীর অন্ধকারময় স্বর্গে আঘাত
বড় বিচ্ছিরি সেদিনের বেড়ে ওঠা, কুৎসা চুপ চুপ

এভাবেই চলল সময় - দিন - মাস - বছর সময়ভর
গলাবন্ধ হাঁটু অবধি কামিজ আর দেহ ভর্তি কাপড়,
ওড়না চাপা তারি স্তন, এদিক ওদিক না হওয়া যুগল
পবিত্র শরীরকে অপবিত্র কালো ছায়া হতে বাঁচাতে মশগুল
আমার নারী মনের নারী দেহের পৃথিবীটা নিশ্চুপ।

অটোয় পাশে বসা ভদ্র ছেলেটির টিপ করে টোকা,
হাতল ধরার ছুতোয় আমার পিঠে আলতো ধাক্কা
আমি চোঁচাই কিন্তু খুব শিটিয়ে খুব আস্তে

এই তো রীতি-নীতি কে পেরেছে তা ভাঙতে
আর মা চোঁচায় রাত করে ফেরা বারন কিসের সে ভয়!

একদিন স্কুটারের ওঠার রস ভরা আমন্ত্রণ আমাকে
আমি এক ছুটে স্বপ্নে হাড় হিম হওয়া ন্যাকা সুখে
ছিঃ লোকে এক লহমায় আমায় নামিয়েছে বেশ্যার দলে
মনে পড়েনি মন্দ মেয়েদের যারা প্রতিদিন যাচ্ছে জ্বলে
রোজ রাতে যাদের নয়ত একবার করে মরতে হয়।

আর আমার সেরা কলেজের ‘ইন্টেলেকচুয়াল প্রেমিক’।
বোকা আমি, যৌনাচারে নিরুৎসাহী শুধুই নাকি কাব্যিক!
তাই ঘ্যাচ করে সম্পর্কে কাঁচি চালানো ছয় মাসে....
অথচ তুমি নিজে প্রেম চালাচ্ছ তিন তিনটে মেয়ের সাথে
আর আমি একা বাড়িতে - - চোখের জল।

তবুও দিল্লীর রাস্তা হতে ফেরে চোখা চোখা শব্দ;
কামদুনির শাখাপ্রশাখা তীক্ষ্ণ বাণে হয় বিদ্ধ;
মনিপুরের মাটিতে ঘিরে ধরে বন্দুকধারী পোড়া নল;
জাপটে ধরে আমায়, আকড়ে ধরে আচল।
পবিত্রতা আমায় তুলো গুঁজে বলে, তাড়াতাড়ি চল

সব পোশাক ভেদ করে গিলছে শুন, যৌনি, মাংসপিণ্ড।
তোমার আঙুলে কলুষিত আমার ঋতুস্রাবের রক্ত;
আমি-আমরা সব মেয়েছেলেরা তোমার কাছে উলঙ্গ।
? খুব খেন্নায় নির্ভয়া তাই নির্ভয়ে হল স্কুলিঙ্গ
আর আমরা রয়ে গেলাম অধমিতা চুউউউপ।।

মানুষ ভালো আছে

নীলাদ্রি বিশ্বাস

ভালো থাকা ছোট দুটি শব্দ। অথচ কী ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। ভালো থাকা শব্দদ্বয়ের শ্রবণে মন ---- হারিয়ে যায়। শুকিয়ে যায় -----। একটা একটা করে মুহূর্ত অতিবাহিত হয়। একটা একটা করে --- সময়ের দল হারিয়ে --- কালের গর্ভে। ভালো থাকা এরই মাঝে এই শব্দদ্বয়ের মহাত্ম্য মানসিক টনিকের কাজ করে।

মানুষক সমাজবদ্ধহীন হলেও এই ভালো থাকার অর্থ এক একজনের কাছে এক একরকম। পরিবার এখন যৌথ থেকে অনু। তখন ছিল একমাত্র ভালো লাগা। এখন আর একরকম। স্তর হয় অভিভাবককে সম্মান করা এক সময় আবশ্যিক ভাবে ভালো লাগা মতোই ছিল। এখনকার অসম্মান কিংবা পূর্ব ঐতিহ্যকে পান্ডা না দেওয়া আর একদল মানুষকে ভালো লাগায়। শিক্ষক সমাজকে ভালো লাগত বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে। এখন ভালো লাগে প্রাইভেট টিউশনের ‘বেওসাদার হিসাবে! ভালো লাগত দিঘী, জলবায়ে পরিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকে। এখন ভালো লাগে সে সব বুজিয়ে গড়ে ওঠা বহুতল অট্টালিকা সমূহ। নদীয়ালি মাছের ভীড়ে ভরে ওঠা বাজার একসময় বড় ভালো লাগত। এখন ভালো লাগে বিদ্যুতের শক কিংবা বিষ দিয়ে মেরে ফেলা মাছের ভীড়ে ভরে ওঠা বাজার। ভালো লাগার তালিকায় ছিল সবুজ অরণ্য, প্রচুর মহীরুহের সম্ভার। এখন ভালো লাগে সে সব গাছ কেটে অরণ্যকে ফাঁকা করে দিতে। ভালো লাগার আবেশে মন ভরে যেত। অপূর্ব সুর এবং কথার সমৃদ্ধ সোনারা দিনগুলোর সঙ্গীত শুনতে। এখন ভালো লাগে অবশ্যই শুধুই ছন্দ সমৃদ্ধ দ্রুতলয়ে বয়ে চলা কথা এবং সুরের আসা থেকে গোড়া না বোঝা সঙ্গীতের সম্ভার। ভালো লাগত নারী জাতিকে সম্মান করতে। এখন ভালো লাগে সেই মা বোন দিদিদের অসম্মানের কদান্ত মাটিতে টেনে নামাতে। ভালো লাগাদের ভিড় এভাবেই কিন্তু বাড়তে থাকবে। বেকারিং ভেসিমেলের মতো।

মানুষ এভাবেই ভালো লাগার সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করছে নিজেদের মর্হিমতো।

ইলা, সুদুগ্ন এবং আমি

কল্যাণ ব্যানার্জি

জন্মের পর প্রথম উৎসব আসে নামকরণের। আমারও এসেছিল, বেশ ধুমধাম করেই, আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু মানুষের সমাগমে। কারণও ছিল একটা তিন কন্যা সম্ভানের পর বাবা মায়ের কাঙ্ক্ষিত পুত্র সন্তান আমি। নাম হল জয়ন্ত। বেশিদিন বয়ে বেড়াতে হয়নি সে নাম। স্কুলের গণ্ডি পাড় হবার আগেই সবার সামনে ফুটে উঠল এক নতুন পরিচয়। বার্তাটা আমার কাছে একান্ত আপনার রূপ। সব ছেড়ে বেড়িয়ে গেলাম। নিজেই নিজের নাম রাখলাম ইলা। সব কিছুর মতো পাল্টে গেল আমার ঠিকানা আমার আস্তানা। মিশে গেলাম আমার মতো আরো যারা আছে তাদের সাথে।

স্বপ্ন দেখাও গেল পাল্টে। এখন আর আগের মত করে স্বপ্ন আসে না। কিন্তু স্বপ্ন দেখি আমি রোজ রাতে। তবে আমার মতো আমার স্বপ্নে এখনো আসে নারী। যে নারী পরিচয় দেয় বিষ্ণুপুরাণের মনুর কন্যা বলে। সেও নাকি আমার মতো ইলা। মহাভারতের ইলা। বুধের সংস্পর্শে এসে বিয়ে করে বুধকে। পুরুষরা তাদেরই সম্ভান। রাতে এসে এমনটাই বলে সে। - আমি মহাভারতে বন্দি। ব্যাসদেব তার মহাকাব্যে আমার স্থান করে দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন। আমার স্বামীর জন্মদাতা পিতা হলেন চন্দ্র আর বৃহস্পতি হল হলেন তার পালক পিতা। আমার একমাত্র শাশুরির নাম তারা। মর্ত ভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন আমারই পুত্র, সেই আদি পুরুষ....।

আদি কালের বদ্যি বুড়ি ইলার কথা মনে পড়ে সকালে ঘুমভাঙার পর। বুধ, বৃহস্পতি, তারা কি যে বলে বুড়িটা কিছুই বুঝি না। স্বপ্ন নিয়ে এত ভাবনাই বা আসছে কেন আমার তাও বুঝি না। একবার মাসিমার কাছে গেলে হয় না? আমার নিজের মায়ের দিদি, স্নেহ করেন খুব। নাঃ থাকগে, গেলেই মেসো খেঁকিয়ে উঠবেন ‘অপয়া’ বলে।

যতই ভুলে যাবার, উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে ইলা মহাভারতের ইলাকে, ততোটাই চেপে বসছে স্বর্গের ইলা মর্তের ইলার ঘাড়ে। রোজই স্বপ্নে দেখা যায় তবু আজ যেন বেশি করে ভাবাচ্ছে। রাতের প্রতিক্রিয়া, স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া থাকে সে। কিন্তু ঘুম আসছে না কেন। আমাকে তো ঘুমোতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে, সে কেন আসে বারাবার আমার কাছে, জানতে হবে যে আমার। এতো দিন যাকে পান্ডা দেয়নি আজ তাকেই পেতেই উদগ্রীব হয়ে ওঠে মর্তের ইলা।

ইলা আসে ইলার ঘুমের মধ্যে। স্বপ্নে।

— কি গো সারাদিন খুব ছট ফট করেছ?

ক্রমবর্ধমান আধুনিকতা? নাকি কলিযুগের অন্ধপাঁক? একে কি বলা যায় বলুনতো?

কবি বলেছিলেন এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। কবির কথা ময়, শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষের অন্তরের ইচ্ছেতেই সুপ্ত হয়ে থাকে এ বাক্য বন্ধ। কিন্তু পৈশাচিক বিষবাক্সের ভীড়ে আধুনিক সভ্যতার ভবিষ্যতের চারাগাছ সত্যিকারের অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে এতেও বোধ হয় এক শ্রেনীর মানুষ ‘ভালো লাগার’ স্তরে আক্রান্ত!

হা মানুষ ধন্য তোমার ভালো লাগা। ধন্য তোমার ক্রম পরিবর্তনশীল মানসিক মানসিক অবস্থা। মানুষ নামক জীব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অথচ কি নিপুণতার আজকের কিছু মানুষ নরকের কীটসম হয়ে ওঠে নিজের কন্যাসম কোন নারীর (কখনও কখনও আপন কন্যাকেও!) চরম স্ত্রীনতাহানি করে। এও তো একজাতীয় আধুনিক ভালো লাগা।

বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে হৃদয়ের গভীর থেকে। একটু একটু করে চেটে তা স্বাদ গ্রহণ করে মানুষ। অপেক্ষায় থাকে আরো রক্ত ক্ষরণের। অপেক্ষায় থাকে আরো অনেক কিছুর। প্রবল লোভ ও লালসায় মাখা দুটি চোখ মাপতে থাকে সমাজের দেহ। টুকরো টুকরো করে তাকে ছড়িয়ে দিয়ে ভাগ করে মানুষ। প্রতিটি ভাগ সমান হওয়া চাই। পরিত্রিটি বিন্দু রক্তের হিসেব চাই। লোভী মানুষের দল সমানভাগে পাবে। সমাজের দেহ অংশ এবং রক্ত বিন্দুর প্রচুর সম্ভার। একটা একটা করে নতুন নতুন করে ভালো লাগার বিষয় তৈরি হয়। মানুষের রসনা তার সবটুকু স্বাদকোরক দিয়ে সে ভালো লাগার সম্পূর্ণ উজার করে গ্রহণ করে। মানুষ এভাবেই ভালো ছিল, ভালো থাকবে, হয়তো সুদূর ভবিষ্যতেও অনেক ভালো থাকবে!

মন খারাপ করবেন না কেউ। এতক্ষন শুধু ভালো থাকা’র কথাই হল। মানুষ খুব খুব ভালো আছে তাই না

— হ্যা গো, ঠিক তাই। আমি কেন তোমার জন্য

— ছটফট করো তাই তো? তুমি যে ইলা গো, ভারতের তোমার সম্মান? না গো, কেউ দেয় নি তোমায়। কিন্তু শোন, তুমি, আমি আমরা সবাই মনুর সন্তান। মানব।

— আমি পুরুষ থেকে নারী হয়েছি। তুমিও কি তাই? নাকি চন্দ্রনালী গুপ্ত বা নির্বানের মধ্য দিয়ে তুমি পুরুষ থেকে নারী হয়েছে? লিঙ্গচ্ছেদ করে তোমায় নারী করা হয়েছে?

— না গো আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল তার একটি মেয়ে হোক। আমি তাই হয়েই জন্মালাম, নাম হলো ইলা। মৈত্রাবরণের প্রভাবে আমিই হয়ে উঠলাম পুরুষ। নাম হলো আমার সুদুগ্ন।

— আবার মেয়ে হলে কি ভাবে গো? আজ আর ইলার স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে না।

কত জানবার আছে তার। জানতেই হবে তাকে

— আবার লিঙ্গ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমি মেয়ে হয়ে গেলাম। আবার আমি ইলা।।

— বলো কি?

— হ্যা গো, তাই। দেবতার অভিশাপে আবার আমি ইলা। চন্দ্রপুত্র বুধের সাথে আমার মিলন হয় এই সময়। জন্ম হয় পুরুষবার।ক মহাভারতে আমি একা নই, যাদের তোমরা কি যেন বলো.....

— ()

হ্যা। তবে সবাই সম্মানীয় মহাভারতে। যা তোমরা পাও না ভারতে।

— আমরা সেটা পেতে চলেছি। মর্তের ইলার কথা শুনে একটু হাসলেন মহাভারতের ইলা। তারপর কথা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায়। আগে মানুষ ভালোবাসত শিশুক। সমাজে গ্রহণ যোগ্যতা আসুক। আয়ের সুস্থ স্বাভাবিক পথ দিয়ে হেঁটে যাক তারা। ঘৃণা নয়, অপয়াও নয়। মহাভারতে মনুর সন্তান তারা।

মর্তের ইলার চোখে রাতের স্বপ্ন যেন আকাঙ্ক্ষা হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় বুধের মতো কাউকে পেতে। যেমন পেয়েছিল মনুর কন্যা স্বর্গের ইলা, সুদুগ্ন ইলা। জন্ম হোক আরো একটি পুরুষবার।

ধর্ষণের সংস্কৃতি

প্রান্তিক লিঙ্গ ও যৌনতার মানুষদের ওপর যৌন নিগ্রহ নিয়ে কিছু প্রাথমিক বক্তব্য

অনিরুদ্ধ দত্ত

ভূমিকাঃ কিছুটা ব্যক্তিগত

আমাদের সমাজে এক বৃহৎ শ্রেণীর মানুষদেরকে তাঁদের ‘ভিন্ন’ যৌনতা বা লিঙ্গের কারণে প্রান্তিক করে দেওয়া হয়, যেহেতু তারা সামাজিক ধারণা অনুযায়ী ‘নারী’ বা ‘পুরুষ’ হিসেবে বিবেচিত হন না, বা নারী-পুরুষের মধ্যে বিসমকামী যৌনাচরণ না করে অন্য ধরনের যৌনাচরণ করেন। এই প্রান্তিককরণের একটি প্রকাশ্য রূপ হল যে ভিন্ন লিঙ্গ বা যৌনতার মানুষদের ওপর নানারকম যৌন হেনস্তা বা নিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও সমাজ, রাষ্ট্র বা আইন সেই নির্যাতনকে স্বীকার করে না, বা করলেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। স্বাধীনতার এত বছর পরে আজও ভারতবর্ষের আইন অনুযায়ী ধর্ষণ বা রেপ মানে শুধুমাত্র (জৈবিক) পুরুষের দ্বারা (জৈবিক) নারীর ওপর বলপূর্বক প্রবেশমূলক যৌন আচরণ। জন্মসূত্রে যারা ‘পুরুষ’ বা ‘অন্তর্লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হন, আজও তাঁদের আইনের চোখে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার হিসেবে গণ্য করা হয় না। অথচ যৌনসংখ্যালঘু বা প্রান্তিক লিঙ্গের অনেক মানুষ জন্মসূত্রে ‘পুরুষ’ চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন রকমের যৌন নিগ্রহের শিকার হয়ে থাকেন। বিশেষত নিম্নবিভক্ত কোতি ও হিজড়ে সম্প্রদায়ের মানুষেরা, অর্থাৎ রূপান্তরকামী নারী, অর্থাৎ রূপান্তরকামী নারী, মেয়েলী পুরুষ, ‘তৃতীয়’ লিঙ্গ ইত্যাদি পরিচয় মিলিয়ে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা, প্রতিনিয়ত নানারকম যৌন নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। কিন্তু পুলিশ-আদালত বা আইন-কানূনের মারফতে সেই অত্যাচারের সুরাহা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অতয়েব মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার এবং পূর্ণ নাগরিত্ব এমনকি পূর্ণ মনুষ্যত্ব থেকে তাঁরা বঞ্চিত থাকেন।

কিন্তু শুধু সমাজ বা আইন কেন - আমরা যারা প্রচলিত যৌন আচরণ বা লিঙ্গ পরিচয় থেকে একটু আলাদা, আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যৌন হেনস্তা বা নির্যাতনকে অনেক সময় যথেষ্ট গুরুত্ব দিই না। এই ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করি। একবার ট্রেনে করে উত্তরবঙ্গ যাচ্ছি। আমার সীট পড়েছিল মিডল বার্থে। রাতে শুতে যাওয়ার আগে আমি বিছানা করছি, এমন সময় একজন মাঝবয়সী ‘ভদ্রলোক’, যিনি সাইডের বার্থে ছিলেন, সুযোগ পেয়ে পেছন দিয়ে এসে হঠাৎ আমার পশ্চাদ্দেশে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি চমকে গিয়ে সরে এলাম; এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু এখানেই শেষ নয় - তারপর আমি বাথরুমে যাওয়ার সময় লোকটি আমার পেছনে পেছনে এল, পাশের বাথরুমে ঢুকল। যখন বেরোলাম, দেখলাম পাশের বাথরুমের দরজা খোলা। লোকটা তার প্যান্ট খুলে যৌনাঙ্গ বার করে কুৎসিত অঙ্গ-ভঙ্গি করে আমাকে ভেতরে ডাকছে, মুখে বলছে ‘হ্যালো ফ্রেন্ড, হ্যালো ফ্রেন্ড’। এই দৃশ্য দেখে আমার সারা গা ঘিন ঘিন করে উঠলো, বিবমিষার উদ্বেক হল। কোনরকম উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আমি আমার নিজের বার্থে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম, তবুও লোকটি আরও বেশ কিছুক্ষণ আমার বার্থের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করল। হয়ত ধর্ষণ জাতীয় গুরুতর যৌন নিগ্রহের তুলনায় এটি একটি সামান্য ঘটনা। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় যে পরবর্তী কালে যখন আমি আমার কিছু যৌনসংখ্যালঘু বা রূপান্তরকামী বন্ধুদেরকে ঘটনাটির বিবরণ দিলাম, দেখলাম যে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই স্বীকার করতে নারাজ যে লোকটির ব্যবহার আদৌ যৌন হেনস্তার পর্যায়ে পড়ে। একজন বন্ধু বলল, কি আছে, ‘তুমি ওর সাথে করে নিতেই পারতে। না হয় কিছু টাকা নিয়ে নিতে!’

আরেকটি ঘটনা বলি - কয়েক মাস আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলাম। দলের মধ্যে প্রায় সবাই কোতি বা হিজড়ে সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা হোটেল ঢোকার পর কয়েকজন ছেলের সাথে আলাপ হল; তাদের আচার-ব্যবহারে আমাদের প্রতি যৌন আকর্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেইদিন রাতে তাদের মধ্যে একটি ছেলে আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল, যাতে তার সাথে আমি কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটাতে পারি। পরের দিন আমরা বন্ধুরা মিলে সারা সকাল ঘুরে বেড়ালাম, বেড়িয়ে এসে যখন দুপুর বেলায় হোটেলের ঘরে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ আগের রাতের সেই ছেলেটি তার এক বন্ধুকে নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ল। দুজনেই আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাইল। আমি যখন তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাইলাম, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন আমায় বলল, ‘কি আছে, করেই ফেল না। বেচারি এত আশা করে এসেছে।’ বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই মনোভাব দেখলাম যে যেহেতু ছেলেগুলোর মধ্যে একজনের সাথে আমার আগে যৌন সম্পর্ক হয়েছে, এখন আমার আর আপত্তি করা সাজে না - তার যেন আমার শরীরের ওপর অধিকার জন্মে গিয়েছে। এর পরেও আমি না বলাতে সেই ছেলেটি জোর করে আমার ওপর চেপে গেল; শায়িত অবস্থায় আমাকে চেপে ধরে আমার পিঠের উপর হস্তমৈথুন করে তবে সে ছাড়ল। এটা ‘ধর্ষণ’ হিসেবে গণ্য করা যায় কি না সেই প্রশ্ন পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আবার দেখলাম যে আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন আপত্তি করলেও বাকিরা ঘটনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। এমনকি, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু খানিকটা হাস্যচ্ছলেই বলল, ভাগ্যিস আমি ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিই নি, তাতে নাকি আমাদের ‘কোতি জাতের’ (অর্থাৎ মেয়েলি পুরুষ এবং রূপান্তরকামী নারীদের) কলঙ্ক হত, কারণ আমাদের কাজই নাকি পুরুষ মানুষদের খুশি রাখা।

মধ্যবিভক্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাগতভাবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন আমি তো তাও নানারকম আর্থিক এবং সামাজিক সুবিধে ভোগ করি - আমাদের

জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিম্নবিভক্ত যৌনকর্মী, পেশাদার নাচিয়ে, বা হিজড়ে পেশা অবলম্বন করেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি ঝুঁকির সন্মুখীন হতে হয়। এমন অনেক ঘটনা শুনেছি যে যৌনকর্মীরা বা পেশাদার নাচিয়েরা প্রাত্যহিক ভাবে একাধিক মানুষের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন, অথচ সমাজের ‘রক্ষক’ পুলিশ সেই নিগ্রহের অভিযোগ নিয়ে কোনরকম সাহায্য বা হস্তক্ষেপ করছে তো না-ই, উপরন্তু নিজেরাই উল্টে তাদের আবার ধর্ষণ বা যৌন হেনস্তা করছে। তা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই এই ঘটনাগুলিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিই না। যেমন একবার আমার আরেকজন রূপান্তরকামী বন্ধুর সাথে যৌন নিগ্রহ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সে বিষয়টিকে উড়িয়ে দিল, বলল, ‘কোতিরা আবার রেপ হয় নাকি? কোতিরা তখনই ‘রেপ’ বলে যখন ছেলেটা বিস্ত্রী দেখতে, ছেলেটা সুন্দর দেখতে হলে জোর করে করলেও সেটাকে রেপ বলে না।’ অর্থাৎ মেয়েলি/রূপান্তরকামী মানুষেরা নাকি আদতে সুপুরুষ ছেলেদের দ্বারা ধর্ষিত হতেই চায়। অতয়েব তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে এবং ধর্ষণ বা হেনস্তার অভিযোগগুলিকে বিশেষ পাত্তা দেওয়ার নাকি প্রয়োজন নেই।

ধর্ষণের সংস্কৃতি

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের মতন প্রান্তিক লিঙ্গ বা যৌনতার মানুষেরাও নিজেদের জনগোষ্ঠীর ওপর ঘটে যাওয়া যৌন নিগ্রহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই না - সমাজ যুক্তি দেখিয়ে আমাদের যৌন নিগ্রহের অভিযোগগুলিকে অস্বীকার করে, সেই যুক্তিগুলি আমরা নিজেদের মনোভাবের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছি। আমরা যেন বুঝে নিয়েছি যে শারীরিক ভাবে ‘নারী’ হলেই তার ওপরে যৌন নিগ্রহ হতে পারবে, না হলে না। তার ওপর আমরা এই ধারণা আত্মস্থ করে নিয়েছি যে যারা ‘নারী’ বা ‘নারীসুলভ’ তারা পুরুষদের ভোগ্যপণ্য, পুরুষদের খুশি রাখাই তাদের কাজ, তাদের নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছের বিশেষ দাম নেই, এবং তারা যদি যৌনতার প্রতি আগ্রহ দেখায় বা তাদের যদি একাধিক যৌনসঙ্গী থাকে, তাহলে তাদের পরবর্তীকালে যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার অধিকার নেই (যদিও পুরুষদের একাধিক যৌনসঙ্গী থাকলেও তাদের সেই অধিকার বজায় থাকে)।

এই জাতীয় মনোভাবগুলিকে নারীবাদী পরিভাষায় ‘রেপ কালচার’ বা ‘ধর্ষণের সংস্কৃতি’ বলা হয়ে থাকে। বহু নারীবাদী চিন্তক এবং সমাজকর্মীদের মতে এই সংস্কৃতিক মনোভাবগুলির পেছনে আছে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা। আমাদের দেশের ইতিহাস এবং আধুনিক সমাজে মহিলারা পরিবারের বাইরে নানারকম ভূমিকা পালন করে থাকা সত্ত্বেও নারীর নিজস্ব যৌন পরিচয় বা আকাঙ্ক্ষার জায়গা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সীমিত, সে শুধুমাত্র পিতা থেকে পুত্রের মধ্যে বংশ পরম্পরা ধারণ করার একটি পাত্র, যেহেতু তার নিজস্ব বংশপরিচয়, সম্পত্তি বা পরম্পরা বলে বিশেষ কিছু থাকে না। অতয়েব এই পিতৃতান্ত্রিক বংশ পরম্পরার ধারক হিসেবেই তার যৌনতার একমাত্র বা প্রধান সামাজিক স্বীকৃতি, কারণ বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে সে যদি নিজের ইচ্ছে মত তার যৌনতা প্রকাশ করে তাহলে সেটি পুরুষকেন্দ্রিক বংশ পরম্পরাকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়। অতয়েব মহিলাদের সেই পিতৃতান্ত্রিক ভূমিকার মধ্যে আবধ্য রাখার জন্যে পরিবার এবং সমাজ তার যৌনতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষাকে আত্মসম্বরণ করতে শেখায়; মহিলাদের শেখানো হয় যে তাদের যৌনতা বা বিসমকামী একগামী সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই তার ‘সম্মান’ বা ‘ইজ্জত’ বজায় থাকে, নইলে নয়। যে মহিলা নিজের ইচ্ছে মতন যৌন সম্পর্ক করে তার নাকি কোনো ‘সম্মান’ বা ‘ইজ্জত’ নেই, সে ‘চরিত্রহীন’, অতয়েব তার পুরুষদের না বলারও অধিকার নেই, অর্থাৎ পুরুষেরা তাকে ধর্ষণ করলেও কোনো ‘সম্মান’ বা ‘ইজ্জত’কে ক্ষুন্ন করা হয় না এবং তার শরীরের ওপর পুরুষদের আজন্ম অধিকার জন্মে যায়। এই কারণে আমাদের সমাজ মহিলা যৌনকর্মীদের ওপর যৌন নির্যাতনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না, যেহেতু ধরা হয় যে সে তারা ‘ইজ্জত’ খুইয়েই ফেলেছে; এবং কোনো মহিলা যদি যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেন তাহলে তাকে পুলিশ এবং আদালতের সামনে বারংবার প্রমাণ করতে হয় যে তার ‘চরিত্রে’ কোনো ‘কলঙ্ক’ নেই অর্থাৎ তিনি ইচ্ছে মতন যৌন সম্পর্ক করেন না এবং বিবাহ বা একগামী সম্পর্কের মধ্যেই নিজের যৌনতাকে সীমাবদ্ধ রাখেন (যদিও কোনো পুরুষকে অবশ্যই তা প্রমাণ করতে হয় না)। উপরন্তু তাকে তার পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়। এইভাবে ধর্ষকের থেকে ধর্ষিতার ওপর দোষ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। (যাকে ইংরিজিতে বলে victim blaming, অর্থাৎ অপরাধীর পরিবর্তে নির্যাতিতা মানুষকেই উল্টে দোষারোপ করা)। আমাদের সমাজে ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে যদিও বা গণ্য করা হয়, তার কারণ এই নয় যে মহিলার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনমিলন করা হচ্ছে, তার কারণ এই যে ধর্ষণ মহিলাদের ‘সম্মান’ বা ‘ইজ্জত’কে কলুষিত করে, মানে তাদের যেভাবে বৈবাহিক বা একগামী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার কথা তা বিঘ্নিত করে, অর্থাৎ ধর্ষক অন্য কোনো পুরুষের ‘সম্পত্তির’ ওপর হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু যদি কোনো মহিলার স্বামী তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনমিলন করে তাহলে সেটাকে আইনত ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা যায় না, কারণ ধরা হয় যে স্বামী হিসেবে তার স্ত্রীর শরীরের ওপর অধিকার আছে এবং সেখানে সেই মহিলার ইচ্ছে বা অনিচ্ছের কোনো দাম নেই (এই বিষয় পাঠক/পাঠিকা সূচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস অবলম্বনে ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘দহন’ চলচ্চিত্রটি দেখতে পারেন)।

মহিলাদের পিতৃতান্ত্রিক বংশ পরম্পরার ধারক হিসেবে যে অত্যন্ত সীমিত এবং মেকি ‘সম্মান’ বা ‘ইজ্জত’ আছে, কোতি-হিজড়ে-মেয়েলি পুরুষ-রূপান্তরকামী নারী ইত্যাদি প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষেরা সেই ন্যূনতম ‘সম্মান’ বা ‘ইজ্জত’ থেকেও বঞ্চিত। পুরুষদের অপেক্ষায় তাদের অনেক ক্ষেত্রেই ‘জৈবিক’ নারীদের থেকেও অধম অবস্থান যেহেতু তারা বংশ পরম্পরা ধারণ করতে পারবেন না এবং স্ত্রী বা মাতা হিসেবে যে সীমিত সম্মান, সেইটুকু পেতে পারবেন না। অতয়েব পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে তাদের যৌনতার ভূমিকা শুধুমাত্র নারীসুলভ ‘শরীর’ হিসেবে পুরুষদের আনন্দ দেওয়া। ওদিকে আবার পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে পৌরুষের যে সাম্মানিক, অবস্থান, সেখান থেকেও অনেক ক্ষেত্রে এরা (অর্থাৎ আমরা) বঞ্চিত। পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে ‘নারীত্ব’ বা ‘মেয়েলিত্ব’কে এমনিতেই ‘পুরুষত্বের’ তুলনায় খাটো করে দেখা হয় - কিন্তু তা যদি আবার ‘পুরুষ’-চিহ্নিত শরীরের সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে সেটা যেন আরও বেশি লজ্জাজনক হয়ে ওঠে। তাহলে সে ‘আসল’ পুরুষও নয়, আবার সামাজিক ‘নারী’র যে যৎকিঞ্চিৎ সম্মান, সেখান থেকেও বঞ্চিত। অতয়েব তার বিরুদ্ধে শারীরিক নিগ্রহ যেন কোনো নিগ্রহই নয়, এবং সমাজ এবং পুলিশী ব্যবস্থা এই ধরনের অভিযোগকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। এই বছরেই কোচবিহার জেলায় একজন রূপান্তরকামী ও কোতি জনগোষ্ঠীর মানুষের সাথে ঘটে গেল এমনই একটি ঘটনা। পূজা নামক একজন রূপান্তরকামী নারী, যিনি কোচবিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে থাকতেন, কিছু স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীর কাছে অশালীন ব্যবহার ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হন। তিনি যখন পুলিশের কাছে সহায়তা চাইতে গেলেন, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, বলা হল, পূজার মতন মানুষদের সাথে এরকম একটু-আধটু হয়েই থাকে। এর পর তার অত্যাচারীরা যখন জানতে পারল যে সে থানায় যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে তারা তাকে গণধর্ষণ করল, এবং পূজা তার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। এত কিছু পরেও নিকটবর্তী পুলিশ থানা কোনো পদক্ষেপ নেয় নি; ঘটনার বেশ কিছু দিন পর মৈত্রীসংযোগ সোসাইটির কিছু সদস্য ঘটনাটির বিষয়ে জানতে পেরে গ্রামে যায় এবং অবশেষে পুলিশের কাছে একটি জেনারেল ডায়েরি লেখাতে সক্ষম হয়(১)।

প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষজনদের ওপর এরকম বহু যৌন নির্যাতনের ঘটনা ছাড়াও আছে আরেক ধরনের লিঙ্গ-ভিত্তিক নিগ্রহ - রূপান্তরকামী বা হিজড়ে মানুষদের মধ্যে আসল - নকল ভেদাভেদ এবং তথাকথিত ‘নকল’ হিজড়াদের প্রতি নানারকম অপমান এবং শারীরিক নির্যাতন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ‘হিজড়ে’ বা ‘কোতি’র মত প্রান্তিক লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারকম বৈচিত্র আছে, এবং সবার মানসিক পরিচয় বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য ঠিক একরকম নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় যৌনসংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক লিঙ্গের জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যাদের নিজস্ব ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আছে, এবং এই বৈচিত্রময় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে নানা ধরনের মানুষজন আছেন। যেমন ‘কোতি’ বা ‘মেটি’ মানে মেয়েলি পুরুষ-রূপান্তরকামী নারী-‘তৃতীয় লিঙ্গ’ ইত্যাদি পরিচয় মিলে একটি সম্মিলিত বৃহৎ জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে কেউ ‘ভেলি’ অর্থাৎ বেশিরভাগ সময় নারীবেশে থাকতেই পছন্দ করেন, কেউ আবার ‘কড়ি’ অর্থাৎ আংশিক ভাবে পুরুষ বেশেও থাকেন। নিজেদের মধ্যে নানারকম বৈচিত্র, বিভেদ এবং তদসংক্রান্ত ঝামেলা সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠীগুলি এত বছর ধরে তাদের ঐক্যতা বজায় রেখেছেন। বহু গবেষক দেখিয়েছেন যে হিজড়ে গোষ্ঠীর মধ্যেও এইরূপ বৈচিত্র রয়েছে (২)। এটা এখন আর অজানা নয় যে খুব কম সংখ্যক হিজড়ে গোষ্ঠীর মানুষ অন্তর্লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জন্মায়, এবং অনেক মেয়েলি কিশোর বা কোতিরাও হিজড়ে দলে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ পুরুষাঙ্গ অস্ত্রপচারের মাধ্যমে বাদ দিয়ে ‘নির্বাণ’ হয়ে যান, আবার কয়েকজন ‘আকুয়া’ মানে তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ যৌনাঙ্গ নিয়েই থেকে যান। কিন্তু সমাজের মধ্যে একটি ধারা প্রচলিত আছে যে শুধুমাত্র যারা জন্মসূত্রে অন্তর্লিঙ্গ তারাই ‘আসল’ হিজড়ে, বাকিরা ‘ভেকধারী’ বা ‘নকল’। তথাকথিত ‘আসল’ হিজড়াদের সমাজ দূরে সরিয়ে রাখলেও ভয় পায়, যেহেতু জৈবিক অন্তর্লিঙ্গতার সাথে নানারকম ধার্মিক এবং সামাজিক সংস্কার জড়িয়ে আছে। কিন্তু যদি জানা যায় যে কোনো নারীবেশধারী বা মেয়েলি আচার-আচরণের মানুষ শারীরিক ভাবে ‘আসলে পুরুষ’ তাহলে তার ওপর নানারকম অত্যাচারের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। জন্মসূত্রে ‘হিজড়ে’ বা ‘অন্তর্লিঙ্গ’ হওয়ার চেয়ে শারীরিক ‘পুরুষ হয়ে নারীসুলভ আচরণ করা বা পোশাক-আশাক পরা যেন আরও বেশি ঘৃণ্য বা লজ্জাকর। একজন গবেষক এবং গোষ্ঠী-সদস্য হিসেবে আমি এই ধরনের ঘৃণার অনেক উদাহরণ দেখেছি বা শুনেছি। যেমন, কয়েক মাস আগে নদিয়া জেলার রাণাঘাট শহরে একজন কোতি জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে একটি হিজড়ে দলে যোগদান করেছিলেন এবং ট্রেনে ‘ছল্লা’ করতেন অর্থাৎ যাত্রীদের আশীর্বাদ করে টাকা চাইতেন। একদিন ট্রেনে লেডিস কম্পার্টমেন্ট-এ জামা কাপড় ঠিক করতে গিয়ে কোনভাবে প্রকাশ হয়ে যায় যে তাঁর পুরুষাঙ্গ আছে। তখন মহিলা যাত্রীরা একত্রিত হয়ে তাঁকে মেরে জোর করে তাঁর কাপড় খুলে দেয়, এবং তাদের মধ্যে একজন তিরস্কার করে বলে, “তুই মন্দা হয়ে এইসব করছিস, তোর লজ্জা করে না।” অর্থাৎ যদি সে ‘আসল’ হিজড়ে হত তাহলে তাকে তাও হয়ত ক্ষমা করা যেত, কিন্তু তথাকথিত ‘পুরুষ’ হয়ে নারীবেশ ধারণ করা বা হিজড়ে বৃত্তি করার ‘অপরাধ’ যেন আরও বেশি লজ্জাজনক এবং ক্ষমার অযোগ্য। নদিয়া জেলা থেকে যারা বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে ‘ছল্লা’ করতে যান, তাঁদের মধ্যে একজনের কাছে এরকম আরেকটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা শুনেছি। আগস্ট মাসে পাটনা থেকে মোগলসরাই লাইনে একটি চুরির ঘটনার পর রেল পুলিশ চুরির অভিযোগ দিয়ে সব হিজড়ে গোষ্ঠীর মানুষদের ধরল। থানায় নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক নগ্ন করে পরীক্ষা করে দেখা হল, কে ‘আসল’ কে ‘নকল’। যারা পুরুষাঙ্গ থাকার দরুন প্রমাণিত হল, তাদের

শাডি-ব্লাউস কেড়ে নেওয়া হল এবং তাদেরকে গামছা পরে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল, যাতে সবাই জানতে পারে তারা নাকি আসলে ‘পুরুষ’, এবং সেই এলাকায় তারা আর হিজড়ে হিসেবে উপার্জন না করতে পারে।

অর্থাৎ শুধুমাত্র কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই তাদের পরিচয় নির্ধারণ করা হলো - হিজড়ে, রূপান্তরকামী বা ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ হিসেবে তাদের মানসিক পরিচয় এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে কোনো মূল্য দেওয়া হল না। কিন্তু শুধু সমাজ বা পুলিশ নয়, কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হিজড়ে গোষ্ঠীর নেত্রীরাও অন্য হিজড়াদের ‘নকল’ বা ‘ভেজাল’ হিসেবে ধরিয়ে দিতে চান, যেহেতু তারা চান হিজড়ে প্রথায় তাঁদের প্রতিদ্বন্দীর সংখ্যা কমে যাক - যদিও খুঁজে দেখলে হয়ত বেরোবে যে তাঁদের নিজেদের হিজড়ে ঘরের মধ্যেও অনেক তথাকথিত ‘ভেকধারী’ হিজড়ে রয়েছেন(৩)। রূপান্তরকামী যৌনকর্মীদেরও এই আসল/নকল বিচারের সন্মুখীন হতে হয় - কলকাতার রাস্তায় যৌনকর্ম করেন এমন বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি যে তাদেরকে পুলিশ হুমকি দিয়ে বলেছে, ‘আগে কাটিয়ে আয়, তারপর রাস্তায় দাঁড়াবি!’ এরকম ঘটনাও ঘটেছে যে চুরি বা ডাকাতির অভিযোগে কোনো যৌনকর্মীকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তার ‘আসলত্ব’ প্রমাণের অজুহাতে পুলিশ তার ওপর বলপূর্বক নানারকম শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং এইভাবে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেছে।

ধর্ষণের আইন

এ তো গেল নানাবিধ নির্যাতন ও নিগ্রহের কথা, এবার আসি আইনের প্রসঙ্গে। ভারতবর্ষের আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা শুধুমাত্র জৈবিক পুরুষ (biological male) দ্বারা জৈবিক নারীর ওপর প্রবেশমূলক যৌন আচরণকে স্বীকার করে। বহু বছর ধরে ধর্ষণের আইনে লিঙ্গ নিরপেক্ষতার দাবি তোলা হয়েছে, অর্থাৎ ধর্ষক এবং ধর্ষিত ব্যক্তি দুজনেই যে কোনো লিঙ্গের হতে পারেন, যাতে সমাজ-স্বীকৃত ‘নারী’ ব্যতীত বিভিন্ন লিঙ্গের মানুষদের ওপর ধর্ষণের আইনি স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষমতাবান নারীবাদী সংগঠন সেই লিঙ্গ নিরপেক্ষতার দাবির বিরোধিতা করেছেন। এই সংগঠনগুলির মতে ধর্ষণের আইনকে যদি লিঙ্গ নিরপেক্ষ করা হয় তাহলে মহিলারা ধর্ষণের অভিযোগ করতে গিয়ে আরও বেশি সমস্যার সন্মুখীন হতে পারেন, কারণ তখন অভিযোগটি তাদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বা কোনো মহিলাকে নিরস্ত বা অপদস্থ করতে তার বিরুদ্ধে পুরুষেরা মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগও আনতে পারে। অনেক নারীবাদী সংগঠনের মহিলাদের বিরুদ্ধে আইনি অস্ত্র যোগান দেবে(৪)।

গত বছর দিল্লীতে কুখ্যাত নির্ভয়া-কাণ্ডের পর দেশজুড়ে ধর্ষণ নিয়ে আলোড়ন শুরু হয়। সেই সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক নারীবাদী সমাজকর্মী এবং সংগঠন ধর্ষণের আইন পরিমার্জনের দাবি জানান, যাতে আইন মহিলাদের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, মহিলাদের অভিযোগকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং ধর্ষিতাকে পুলিশ বা আদালতের সামনে তার চারিত্রিক ‘কলঙ্কহীনতা’ প্রমাণ না করতে হয়, বা তার পোশাক-আশাক বা যৌন আচরণ নিয়ে অবাস্তব এবং গোপনীয়তা-লঙ্ঘনকারী প্রশ্নের সন্মুখীন না হতে হয়। একই সাথে কিছু যৌনসংখ্যালঘু সমাজকর্মী লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দাবিও পুনরায় উত্থাপিত করেন, যাতে রূপান্তরকামী এবং যৌনসংখ্যালঘু মানুষদেরও ধর্ষণের আইনের আওতায় মধ্যে আনা যেতে পারে। সরকারের তরফ থেকে প্রথম যে পরিবর্তিত আইনের প্রস্তাব রাখা হয় সেটি ছিল সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, কিন্তু বহু নারীবাদী সংগঠন তার তীব্র প্রতিবাদ করেন(৫)। এই নিয়ে বহু বিতর্কের পর কিছু নারীবাদী সংগঠন একটি উপায় বার করলেন, যে আইনটিকে পুরোপুরি লিঙ্গ নিরপেক্ষ না করে আংশিক ভাবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা যেতে পারে(৬)। তাঁরা প্রস্তাব রাখলেন যে ধর্ষকের লিঙ্গ আইনত পুরুষ হতে হবে, কিন্তু ধর্ষিত ব্যক্তি যে কোনো লিঙ্গের হতে পারে। তাতে মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা যাবে না, কিন্তু রূপান্তরকামী বা যৌনসংখ্যালঘু মানুষদের ধর্ষণের শিকার হিসেবে গণ্য করা যাবে। দুঃখের বিষয় যে লোকসভায় আইনটি যে অন্তিম রূপ পাশ করানো হয়, তাতে এই আংশিক লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয় নি, বরং আবার সেই পুরনো নিয়ম ফিরিয়ে আনা হয়েছে যে ধর্ষক মানে জৈবিক পুরুষ এবং ধর্ষিতা মানে জৈবিক নারীই হতে হবে(৭)। ধর্ষণের এই সংকীর্ণ সংজ্ঞায় বহু মানুষ এবং বিশেষত যৌনসংখ্যালঘু এবং রূপান্তরকামী জনগোষ্ঠীরা বাদ পড়ে গেলেন। এবং তাদের ক্ষেত্রে আইনি সুরাহা বলতে একমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির সেই কুখ্যাত ৩৭৭ ধারা উপলব্ধ রইল, যা কিনা লিঙ্গ-যোনি ব্যতীত যে কোনো যৌনসঙ্গমকেই ‘প্রকৃতি-বিরুদ্ধ’ আখ্যা দেয়। ৩৭৭ ধারা অবলম্বন করে কোনো যৌনসংখ্যালঘু মানুষ তার ধর্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন ঠিকই, কিন্তু একই সাথে নিজেও সেই আইনে অপরাধী বলে গণ্য হতে পারেন। অতয়েব বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময়েই যৌনসংখ্যালঘু ও রূপান্তরকামী মানুষেরা ধর্ষণের বা যৌন হেনস্থার ক্ষেত্রে আদৌ কোনো আইনি অভিযোগ দাখিল করেন না, কারণ তাঁরা বুঝে গেছেন যে পুলিশ বা আইনের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া যাবে না।

উপসংহার

এই পরিস্থিতি বদলানোর জন্যে ধর্ষণের আইনে অন্তত আংশিক লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা আনা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ষণের আইন পরিমার্জন ছাড়াও প্রয়োজন যৌনসংখ্যালঘু এবং বিশেষত হিজড়ে-কোতি-রূপান্তরকামী মানুষদের অর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবিত্ত হিজড়ে-কোতি-রূপান্তরকামী মানুষেরা মূলশ্রোতের কর্মক্ষেত্রেগুলিতে সুযোগ-সুবিধা পান না এবং যৌনকর্ম বা হিজড়েবৃত্তি জাতীয় পেশায় আবদ্ধ

থাকেন, যেখানে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। এই বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন, যেখানে সুপারিশ করা হয়েছে যে রূপান্তরকামী বা হিজড়ে মানুষদের ‘পিছিয়ে পড়া বর্গ’ (backward class) হিসেবে সরকারী চাকরি এবং শিক্ষাব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসন দিতে হবে (৮)। যদিও এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ধাপ, কিন্তু শুধু সংরক্ষণের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কিছু রূপান্তরকামী বা হিজড়ে মানুষদের চাকরি দিলেই সমাজের আমূল পরিবর্তন হবে না, বরং সংরক্ষণ ছাড়াও যেটা অবশ্যই প্রয়োজন তা হল শিক্ষাব্যবস্থায় এবং কর্মক্ষেত্রে একটি বৈষম্য-বিরোধী আইন (anti-discrimination law) যাতে বলা থাকবে যে কোনো মানুষের প্রতি তার যৌনতা, লিঙ্গ পরিচয় বা অভিব্যক্তির ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা আইনত অপরাধ এবং আমাদের সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলির পরিপন্থী। তাছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সমাজ-স্বীকৃত ‘নারী বা ‘পুরুষ’ের ব্যতীত বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয় এবং অভিব্যক্তিকে আরও সম্মানীয় করে তুলতে হবে। আমরা বর্তমানে যে ‘ধর্ষণের সংস্কৃতির’ মধ্যে বাস করি তার যদি সত্যিই আমূল পরিবর্তন করতে হয় তাহলে শুধু ‘জৈবিক’ বা সমাজ-স্বীকৃত মহিলাদের কথা ভাবলে চলবে না, আমাদের এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে হবে যেখানে জন্মসূত্রে পুরুষ-চিহ্নিত হয়ে নারীসূলভ হওয়া, রূপান্তরকামী হওয়া বা তথাকথিত ‘নপুংশক’ হওয়া লজ্জার বিষয় না হয়, পৌরুষের অপেক্ষায় নারীত্ব বা মেয়েলিপনাকে যাতে খাটো করে না দেখা হয়, এবং ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ বা অন্যান্য লিঙ্গ হিসেবে পরিচিত মানুষদেরও যাতে সমাজ-স্বীকৃতি ‘নারী’ বা ‘পুরুষ’দের তুলনায় কোনো ভাবে অবমাননা না করা হয়। এবং ধর্ষণের ধারণাতেও পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে ধর্ষণ এবং অন্যান্য যৌন নিগ্রহকে শুধুমাত্র নারীর ‘ইজ্জত’ বা ‘সম্মান’ হানি হিসেবে না দেখা হয়, বরং নারী-পুরুষ-তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হয়।

লেখক পরিচিতি

অনিরুদ্ধ দত্ত বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক assistant professor হিসেবে কর্মরত আছেন এবং বিগত আট বছর যাবত পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের যৌনসংখ্যালঘু এবং রূপান্তরকামী জনগোষ্ঠীর সাথে একজন গোষ্ঠী-সদস্য হিসেবে গবেষণা করছেন।

অন্তর্টিকা

(১) এই ঘটনার বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি দেখতে পারেন : মৈত্রিসংযোগ সোসাইটি, কোচবিহার, ‘পূজার মতন মানুষদের ওপর এরকম তো হয়েই থাকে’, খবরের কাগজ সংবাদমস্থান, Vol. 6 No. 5, ১৪ই অক্টোবর, ২০১৪।

‘২) হিজড়ে জনগোষ্ঠী এবং প্রথা নিয়ে এখন ইংরিজি এবং বাংলা উভয় ভাষাই বেশ কিছু বই বেরিয়ে গেছে যেগুলির মধ্যে উপরোক্ত তথ্যগুলি উল্লেখিত

সাদায় কালোয় অন্ধকারে কয়েকটি ধূসর ভাবনা

অনিন্দ্য হাজারা

সন ১৯৮৩। ইরানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ খোমেনি ফতোয়া জারি করলেন। সমস্ত ডায়াগনসড্ ট্রান্সসেক্সুয়াল (diagnosed trans-sexual) নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারেন। সমকামিতা মৃত্যুদন্ড যোগ্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হলেও ইরানে লিঙ্গান্তরিত হওয়ার কোনো বাধা রইল না। এরও প্রায় ২৫ বছর পরে, ২০০৮ এ মুক্তিপ্রাপ্ত তানাজ এষাঘিয়ান (Tanaz Eshaghian) নির্মিত তথ্যচিত্র বি লাইক আর্দাস (Be Like Others) -এ ফুটে ওঠে এমনই এক ছবি যা ইরানের সমাজের ভিতর রূপান্তরকামীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে এক অস্বস্তিকর বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফতোয়া জারি হওয়ার পর পঁচিশ বছর কেটে গেলেও বা লিঙ্গান্তরিত হওয়ার আইনি অধিকারের তথাকথিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির পরেও তবে কেন পরিচিত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে, অন্যান্য যে কোনও দেশের রূপান্তরকামী মানুষদের অভিজ্ঞতার মতন যেখানে আইনি প্রতিষ্ঠার পথে নানান প্রতিকূলতা বর্তমান? আখেরে লিঙ্গ রূপান্তর নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত খোদ রূপান্তরিত মানবীরা নিজেরাই। আইন না সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী/মূল্যবোধের বদল, কোনটা জরুরি - ‘ডিম আগে না মুরগি আগে’ এ হেন প্রসঙ্গ পুনরায় উঠে আসে। রূপান্তরকামী মানুষদের সামাজিক স্বীকৃতি এবং মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার প্রশ্নটা আইনি অধিকার-এর মতনই অত্যন্ত জরুরি ভাবে থেকেই যাচ্ছে। এষাঘিয়ানের তথ্যচিত্র যে রূপান্তরকামী ব্যক্তির এসেছেন তাদের বেশিরভাগই পরিবার থেকে পরিত্যক্ত, সামাজিক isolation ও আইনি সুরক্ষার অভাববোধ বা অধিকারহীনতার শঙ্কা এবং কর্মসংস্থান এর ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা নিয়ে মুখ খুলেছেন। ফতোয়ার জেরে অবশ্য অন্য আরও একটা জিনিস ঘটেছে - তা হল নারী - পুরুষ বিভক্ত সমাজ এর অভ্যন্তরে কোনো রকম ব্যতিক্রমী যৌন-লিঙ্গ অভিব্যক্তির বা বলা যাক gender ambiguity-র স্থান ক্রমেই অপসূয়মান। যে কোনো একটা বাক্সে ঢুকতেই হবে। মানে যদি এমন কোনো রূপান্তরকামী মানুষ থাকেন, যিনি ডান্ডারীভাবে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে নিজের লিঙ্গ রূপান্তর ঘটাতে অনিচ্ছুক - তাঁর সেই অনিচ্ছা বা deviation কে অন্যভাবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে - নানা ভাবে একরকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তিনি ‘নারী’ অথবা ‘পুরুষ’ এই দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটি খোপ বেছে নেন, লিঙ্গান্তর ঘটিয়ে। সমাজ ব্যবস্থা, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সর্বোপরি যে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে অনিচ্ছুক রূপান্তরকামী মানুষদের উপর, তা হল

আছে, অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, ভারতের হিজড়ে সমাজ, দীপ প্রকাশনী, কলকাতা, Gayatri Reddy, With Respect to Sex : Negotiating Hijra Identity in South India, University of Chicago Press : Chicago.

(৩) হিজড়েরা অন্য হিজড়েরদের ‘নকল’ বলে আরোপ লাগানোর উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন : ‘ভেজাল বৃহন্নলাদের জুলুমে অতিষ্ঠ শহর’, এই সময়, ৩রা মার্চ ২০১৪।

(৪) ধর্ষণের আইনে লিঙ্গ নিরপেক্ষতার দাবি এবং তা নিয়ে নারীবাদীদের প্রতিবাদ এবং বিতর্ক সম্পর্কে এই প্রবন্ধটি দেখতে পারেন : Flavia Agnes, 2002. ‘Law, Ideology and Female Sexuality : Gender Neutrality in Rape Law’, *Economic and Political Weekly*, March 2, 2002.

(৫) Times News Service, ‘Activists join chorus against gender neutral rape laws’, *Times of India*, March 7, 2013.

(৬) Siddharth Narrain, 2013. ‘Crimes of Exclusion’, *Kafila* (www. kafila. org), March 30, 2013.

(৭) 429 Magazine, ‘India’s progress on rape law throws transgender people under the bus’, 429 Magazine (http ://dot429.com), April 22, 2013.

(৮) রায়-বিষয়ক কিছু প্রতিবেদন : ‘বৃহন্নলাদের জন্যও সংরক্ষণের রায়’, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই এপ্রিল ২০১৪, ‘Supreme Court recognizes Transgenders as ‘Third Gender’, The Times of India, 15 April, 2014.

ধর্মের। একটা অভেদ্য পাঁচিল তৈরি হয়ে চলেছে লিঙ্গান্তরিত রূপান্তরকামী ও যে রূপান্তরকামী মানুষেরা লিঙ্গান্তর চাইছেন না - তাদের মধ্যে। প্রথম দল হয়ে উঠছে ‘ভাল’ রূপান্তরকামী - দ্বিতীয় দল সেই মেরুপত্রের যুক্তিতে ‘খারাপ’, ‘অনৈতিক’, ‘অধার্মিক’, এবং ‘নকল’।

কে আসল রূপান্তরকামী বা কে নয়, শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে লিঙ্গান্তরিত রূপান্তরকামীরাই কেবল এ সংক্রান্ত অভিকারসমূহের একমাত্র legitimate উত্তরাধিকারী কিনা এ নিয়ে এ দেশে গোষ্ঠী অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সরকারি বোধোদয় - অমুকের মধ্যে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’-র স্বীকৃতি - ইত্যাদির ঘোষণার ক্ষেত্রে যে ‘ট্রান্সজেন্ডার’ চেতনা অধিকাংশ সময়ে কাজ করে তা হল ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ ইকুয়ালস টু ‘হিজড়ে’। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ইংরাজি ফর্ম-এ ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তবে বাংলা তর্জমা এবং সরকারি বাবুদের মস্তিষ্কে বিষয়টা ‘হিজড়ে’-র বাইরে যেতে খুব একটা সক্ষম হয় নি। উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যেতে পারে জনগণনার (census) ক্ষেত্রে ‘তৃতীয়’ লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিজ্ঞপ্তি জারি, কিস্বা আধার কার্ডে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে পরিচিত হওয়ার নতুন সম্ভাবনা কী। কিন্তু সরকারি ভাবনায় প্রয়োগের দিক থেকে সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। জনগণনার ক্ষেত্রে যেরকম তথ্য আদায়কারী ব্যক্তিদের সঠিক প্রশিক্ষণের বা বলা যায় এ বিষয়ে যোগ্য orientation প্রদান করার ক্ষেত্রে অনেকটাই ফাঁক থেকে গিয়েছে। ঠিক যেমন প্রতিবন্ধী মানুষের অস্তিত্বের বিষয়টাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহকারী দলের অপরিাপ্ত প্রশিক্ষণ বা orientation -এর অভাবের কারণে উঠে এসেছে সীমিত ভাবে। Transgender মানুষদের ক্ষেত্রেও তেমনি। ধরে নেওয়া যাক তথ্যসংগ্রহকারী দলের কেউ কোনো বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন - তিনি কার সাথে কথা বলছেন - অধিকাংশ সময়েই বাড়ির পুরুষ সদস্য তথ্য প্রদান করার কাজটা করে থাকেন - তার উপর নির্ভর করছে পরিবারে কোনো প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছেন কি না, কোনো ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি রয়েছেন কি না, এ তথ্য বেরিয়ে আসবে কি আসবে না। কেবলমাত্র হিজড়ে ডেরায় গিয়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ‘তৃতীয় লিঙ্গের’ জনগণনা যদি হয়ে থাকে তবে বলতে হবে বিসমিল্লায় গলদ রয়েছে। কারণ আদপে হিজড়ে

construction -এর বাইরে দাঁড়িয়েও যে **legitimate** ট্রান্সজেন্ডার অভিপ্রকাশ থাকতে পারে এ ধারণাটাই মূলত অবর্তমান। হিজড়ে শব্দটা মধ্যবিন্ত চেতনায় মুখে আনতে বাধে - তাই পুরুষ-নারীর স্থান মাহাত্ম্যের বিচারে ‘তৃতীয়’ স্থানটাই ক্ষমাযেন্না করে দিয়ে দেওয়া হয় ঐ সকল অববচীনদের। সমীকরণের সহজ হিসাব - তৃতীয় স্থান অধিগ্রহণ করে থাকবে সমাজের যতসব অপাংক্তেয়। সুরক্ষিত রইল প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি। অথচ সংরক্ষণ নিয়ে যদি কথা ওঠে, তখন কিন্তু দোষারোপ করা হবে তাদের, যারা আসলে কোনো দিক থেকেই সংরক্ষিত নয়, সুরক্ষিত নয় - দোষারোপ করবে তারাই, যারা সবরকম সুযোগ-সুবিধাভোগী, প্রাধান্যশক্তিভোগী বর্গ। এভাবেই ক্রমে ‘তৃতীয় লিঙ্গের’ ধারণাটা বদ্ধমূল হয়। খবরের কাগজে আবার বাহারি নাম থাকে ‘বৃহন্নলা’ (কোথাও কোথাও আবার ন্যাক্কারজনক ভাবে ‘নপুংসক’ লক্ষ্য করা গেছে)।

এই প্রশ্নটা করতে ইচ্ছা করে, কেন এক এর পিঠে দুই এর গণিতে ‘তিন’ ঠিক হল? তিন-ই কেন? কেন চার,পাঁচ, ছয়, সাত লিঙ্গ নয়? কেন এই সীমিত পরিসরে ভেঙ্গে দেওয়া হবে কোনো মানুষের লিঙ্গ ভিত্তিক মতপ্রকাশ/অভিব্যক্তিকে? কেন প্রত্যেক মানুষ একেক জন একেকটা স্বতন্ত্র লিঙ্গ-যৌন পরিচিতি নিয়ে থাকতে পারবে না? কেন লিঙ্গ-যৌন সম্ভাবনা অসংখ্য হবে না - হবে না অপরিসীম, সীমাহীন?

ছকে বেঁধে ফেলার লিঙ্গ-যৌনতা পরিচিতির পিছনে কাজ করে যে রাজনীতি - যেখানে সরকারি নিয়মনীতিই হোক কিম্বা কোনো একক বৃহত্তর গোষ্ঠীর আশ্ফালন - তাতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে বসলে দেখা যাবে, ক্ষতি আন্দোলনেরই। কোন রূপান্তরকামী গোষ্ঠী আসল হকদার - এই কোন্দলে বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হতে থাকবে রূপান্তরকামী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অন্য সংখ্যালঘুরা। এমনিতেই ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ বা রূপান্তরকামী বললেই সহজ ধারণা করে নেওয়া হয়, রূপান্তরকামী মানবী বা মেল টু ফিমেল ট্রান্সজেন্ডারদের কথা বলা হচ্ছে। এই **visible** বৃত্তের বাইরে থাকা অন্যান্য রূপান্তরকামী মানুষদের অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চূপ অধিক সময়ে গোষ্ঠীর ক্ষমতা প্রধান বর্গগুলি নিজেরাই। আবার ট্রান্সজেন্ডার (মানবী)দের সঙ্গে ফাঁক রয়েছে হিজড়ে সম্প্রদায়ের। মুশকিল হল তখন উলুখাগড়াদের। রথী মহারথীদের সমরে ঢাকা পড়ে যায় ফিমেল টু মেল ট্রান্সজেন্ডার বা ট্রান্সম্যাসকুলাইন (**transmasculine**) জনগোষ্ঠীদের বা ইন্টারসেক্সড (**intersexed**) ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর। যেন গোটা বৃত্তটাই **dominate** করে আছে মেল টু ফিমেল ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়েরা। খবরের কাগজের সংবাদে বা ফিচারে বা ছবিতে তাই এই গোষ্ঠীরই রমরমা - সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে অনুরোধ আসে যদি কোনো রূপান্তরকামী ব্যক্তিকে (ট্রান্সজেন্ডার উওম্যান হলেই ভাল প্রতিবেদনের সঙ্গে যাবে এমন ছবির জন্য) জোগাড় করা যায় - অনুচ্চারিত থাকে অনুরোধের অনুবাদটা - ‘দেখেই যেন বোঝা যায় ইনি রূপান্তরকামী।’ তাই যাদের দেখে বোঝাবার উপায় নেই, খবরের কাগজে তো দূরস্থান, সরকারি নীতি বা পরিষেবার মধ্যে থেকেও নেই এমন এক অবস্থানে তারা। তাদের অস্তিত্ব সীমানার বাইরে।

পুরাণ, মহাকাব্যে নিজেদের উল্লেখের খড়কুটো টেনে এনে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় ‘তৃতীয় লিঙ্গের’ (কেবলই হিজড়ে বা রূপান্তরকামী মানবী সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে) অস্তিত্বের ডিঙ্গি নৌকা। এই পন্থার দ্বারা নিজেদের অস্তিত্ব তথা অধিকার প্রতিষ্ঠার যথার্থতা প্রমাণ করবার উপায়ের একটা বড় ঝুঁকি রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মমতের মৌরসীপাট্টা যেখানে বর্তমান সেখানে তৃতীয় লিঙ্গের পৌরাণিক দাবি উস্কে দিতে পারে অন্য আরেক ধরনের সংকট। চার হাজার বছরের সংস্কৃতির দাবি, দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক এবং হিন্দুত্ববাদী আবহাওয়ায় কোনঠাসা করে তুলবে না তো অন্যান্য যৌনতার অভিব্যক্তি - যেখানে পুরাণ মহাকাব্যের দোহাই পাড়া অত সহজ নয়? খুব সহজেই কি তবে অন্য মেরু্করণ (যা করা হয়েই থাকে) চালু হবে - সনাতন ভারতীয় যৌনতা (বা লিঙ্গ পরিচিতি) বনাম পশ্চিমি আমদানিকৃত যৌনতার? হিন্দুত্ববাদের পবিত্র যগ্গে কে দেবে পুণ্যাছতি আর কেউ বা পুড়ে মরবে?

লিঙ্গ-যৌন পরিচিতির ক্ষেত্রে (**gender-sexual identity**) ২০১৪’র এপ্রিলের সুপ্রিম কোর্ট-এর রায় তাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও একথা বলে নেওয়া ভাল যে সুপ্রিম কোর্ট-এর রায়টা সম্পূর্ণরূপে সমস্যামুক্ত নয়, বরং বলা যেতে পারে ট্রান্সফেমিনাইন লিঙ্গ যৌন পরিচিতিগুলির ক্ষেত্রেই কোর্ট-এর রায় এর পাল্লা ভারি এবং কার্যত ফিমেল টু মেল এবং ট্রান্সম্যাসকুলাইন মানুষদের পাতে অমৃতকুম্ভ থেকে পড়েছে ছিটে ফোঁটাই। তথাপি যদি কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনা তৈরি হয় লিঙ্গ যৌনতা পরিচিতির পরিসরে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ আলোচনার একপ্রকার ব্যপ্তির, তা হয়ত হতে পারে এই রায়ের হাত ধরে।

পাশাপাশি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদালত মত প্রকাশ করেছেন যে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ হিসাবে বিবেচিত হতে গেলে (শল্য চিকিৎসার দ্বারা) লিঙ্গান্তরিত হওয়া প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জন্মসময়ে ‘মেয়ে’ লিঙ্গ পরিচিতি যাকে দেওয়া হল এরকম এক মানুষ নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন না করেও তার পছন্দের এক লিঙ্গ বেছে নিতে পারেন। যদিও এক্ষেত্রে এই ‘পছন্দের’ সীমানা কতদূর অবধি বিস্তৃত সেটাও একটা

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। লিঙ্গ-যৌনতা পরিচিতি (**gender-sexual identity**) আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ‘পছন্দের অধিকার’ নিঃসন্দেহে অনেকগুলি সম্ভাবনার ক্ষেত খুলে দেয়। যদিও রায়ের মধ্যে থাকা কতগুলি সরকারি কমিটি ইত্যাদি গঠন-এর পরামর্শ ঝুঁকি তৈরি করতে এই নয়া সম্ভাবনাগুলির ক্ষেত্রে, যৌন-লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে নতুন ভাবনার প্রসঙ্গে। বলাই বাহুল্য, এই সরকারি কমিটিগুলো যদি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হয়ে ওঠে - কমিটির মধ্যে থাকা ডাক্তার, সমাজতত্ত্ববিদ, সরকারি আমলা বা অন্যান্য প্রতিনিধিরাই তখন নির্ধারণ করবেন লিঙ্গ-যৌন পরিচিতির সীমানা বা বর্গক্ষেত্রের মাপ। সেখানে এই নয়া সম্ভাবনা যথেষ্ট মারখাবে - এ বিষয়ে সিঁদুর মেঘ দেখে ডরানোটা অস্বাভাবিক নয়। তাই আসল প্রশ্নটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট-এর এই রায় কিভাবে কার্যকরী করা হবে। ১৯৯৭-এ এক ঐতিহাসিক রায় দান করেছিল সুপ্রিম কোর্ট - নারী কর্মীর কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার ক্ষেত্রে। তখন থেকে বিষয়টা নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইন তৈরির আগে অবদি কোর্ট-এর রায়কে (এবং পরবর্তী কিছু জনস্বার্থ মামলার রায়) হাতিয়ার বানিয়েই লড়াই করেছিলেন এ বিষয়ে কর্মী ও আন্দোলনকারী দল। এমনই পন্থা বেছে নিতে হতে পারে আমাদের।

দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে গত দুই দশক সময়কালকে যদি ধরা যায়, লক্ষ করা যাবে যে **LGBT** অধিকার আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক **anti-sodomy** আইন সেখানে প্রায় সবদেশেই বলবৎ। কেবলমাত্র রূপান্তরকামীদের স্বীকৃতি/আইনি অধিকার/ সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বা সুরক্ষা পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়টাই কিছুটা এগিয়েছে (এর মধ্যে সিংহভাগটাই জুড়ে রয়েছে যদিও হিজড়ে সম্প্রদায় এর মানুষজন) । এই ছবিটা রক্ষণশীল বলে পরিচিত দেশগুলি যথা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও কিন্তু প্রায় একরকম। সেখানেও ভারতবর্ষের মত **section 377** (বা তার রকমফের) বলবৎ থাকলেও ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সুর যেন খানিকটা নরম। প্রশ্ন জাগে **transgender discourse** -টা কি তবে রাষ্ট্রের দ্বারা লালিত **hetero-patriarchy**-র **project**-এর মধ্যে নিজেদের অজান্তেই **included** এবং **co-opted** হয়ে গেল, সেখানে **binary** ভেঙ্গে বেরোনোর ছক আসলে কোথাও গিয়ে সেই **binary** কে স্বীকার করে নিয়ে সেই **binary**-র বশ্যতা মেনে নিল? নাকি ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের আন্দোলন - যেখানে অধিকাংশ ট্রান্সজেন্ডার মানুষই নিজেদের লিঙ্গ যৌনতা পরিচিতির সূত্রে **marginaliozed** হওয়ার পাশাপাশি শ্রেণী, ভাষা, বা অন্য ধারায় **marginaliozed** - তারাই আসলে **LGBT** আন্দোলনে অন্য এক জোয়ার আনবে - জাত-পাত (**caste**) আর শ্রেণী (**class**) নিয়ে চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটাবে সেখানে, যেখানে **LGBT** এই শব্দবন্ধনের মধ্যে সব চাইতে কোনঠাসা ‘**T**’। ‘**LGBT**’ ঐক্য এবং বিবিধতার স্মারক **Pride Walk** গুলি ক্রমেই এক **urban phenomenon** হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। এখন তো **Pride Walk** ভারতবর্ষের সব বড় বড় মেট্রো শহরগুলিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা **LGBT** আন্দোলনগুলি **assertion of space** -এর এক বড় সূচক। পাশাপাশি ছোটো কোনো শহরের প্রাউড জোয়ারে গা ভাসানোটাকে সেই শহরের **LGBT** আন্দোলনের কৌলিন্যপ্রাপ্তি ঘটল - এমনটাই ধরা হয়ে থাকে। এই **Pride Walk** যতই **LGBT** অস্তিত্বকে **concretize** করছে - ততই যেন যৌনসংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যের ‘বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’ - ঐক্যের এই মিথটায় ফটল ধরছে।

মধ্যবিন্ত/উচ্চবিন্ত **LGBT** আন্দোলনের পরিসরের বাইরে থাকা শহরতলি বা মফস্বলের রূপান্তরকামী মানুষ বা হিজড়ে বা ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ সমাজ কি তবে এক নয়া আন্দোলন ধারার জন্ম দেবে - যেখানে লিঙ্গ যৌনতার পাশাপাশি **class, caste, language, religion** বা এ হেন বিষয়গুলি যা সামাজিকভাবে অসাম্য তৈরি করে, জমি তৈরি করে দেয় হিংসার এবং বৈষম্যের - তার বিরুদ্ধে তৈরি হবে অন্য কে নেতৃত্বের? যেখানে আন্দোলনগুলির মধ্যেকার মেরু্করণ আর থাকবে না - যেখানে যে সমকামী মেয়েটি বিড়ি বাঁধে আর যোগ্য মজুরি পায় না আর যে হিজড়ে ব্যক্তি প্রতিরাতে ধর্ষিতা হয় পুলিশের হাতে বা উত্তর পূর্ব ভারতের যে কোতির পায়ুতে ঢুকিয়ে দেয় বেয়োনেট সেখানকার সামরিক বাহিনীর সৈন্য - এদের আন্দোলনগুলির চোরাশ্রোত মিলে মিশে এক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করবে এক অবিশ্বাস্য সুনামির।

অনিন্দ্য ‘প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাণ্ড’ (একটি যৌনতা ও মানবাধিকার মঞ্চ) -এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

LGBTQAI আন্দোলঃ একটি প্রাথমিক ভাবনার প্রস্তাবনা

অমিতাভ

একাদশ শ্রেণীর একটি বহুল প্রচারিত সমাজতত্ত্বের পাঠ্যবই-এ ‘বিকল্প পরিবার’ এর উদাহরণস্বরূপ ‘সমকামী’ পরিবার সম্পর্কে লেখা হচ্ছে, এটি একটি ‘বিকৃত’ মানসিকতা। লেখক সমাজতাত্ত্বিক এইটুকু বলে থেমে না থেকে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নির্দিধায় লিখে ফেলেছেন জনৈক গবেষকদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব, যা প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে এর পেছনে রয়েছে জৈবিক ও মানসিক সমস্যা’। পাঠক লক্ষ্য করুন, প্রথমত ব্যবহৃত শব্দটি ‘সমকামী, ‘সমপ্রেমী’ নয়। অর্থাৎ, সম লিঙ্গের সম্পর্ক শুধুই কামের বা যৌনতার। দ্বিতীয়ত, একজন গবেষকেরও নাম বা গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য হাজির না করে, শুধু ‘গবেষকরা দেখিয়েছেন বলে’ একটি অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে শিক্ষাত্রী মননে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ‘বিজ্ঞানবাদের’ কী ভয়ানক অপপ্রয়োগ! স্কুল শিক্ষার পাঠ্যসূচী-পুস্তক ইত্যাদিতে অসত্য-অবৈজ্ঞানিক মিথ্যাচার, ইতিহাস বিকৃতি, বিজ্ঞানের অপব্যাক্যার নানা উদাহরণ নানা সময়েই পাওয়া যায়। এর পিছনে একটি সচেতন উদ্দেশ্য বরাবরই থাকে, একধরনের মৌলবাদকে জনভিত্তি করে তোলার। গুরুত্বের বিচারে সমাজতত্ত্ব বইটির এহেন ‘শিক্ষা’ও সেই উদ্দেশ্যগুলি থেকে খুব পিছিয়ে নেই। মাধ্যমিক অতিক্রান্ত ছাত্রছাত্রীরা যখন বিষয় হিসাবে বেছে নিচ্ছে সমাজতত্ত্ব, ইতিহাসকে বিচার করতে চাইছে সমালোচনা-পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, নানা সামাজিক-দার্শনিক তত্ত্বের সমস্যায়িত (Problematicized) রূপগুলি নিরীক্ষণ করার অনুসন্ধিৎসা তাকে আলোড়িত করছে, সেই সময়ে সেই বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক যখন ‘সমপ্রেম’ সম্পর্কে একটি ভুল নির্দেশ্যবাদী ধারণাকে জ্ঞান হিসেবে মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চায়--- তখন এর পিছনে অবশ্যই একটি সচেতন প্রয়াস কাজ করে। নির্দিধা তা যৌন-মৌলবাদ।

এবার যদি আসা যায় তাদের কথায়, যারা পড়ছেন বা পড়বেন এই বইগুলো। আমরা, যারা ৩৭৭ ধারার বিপক্ষে প্রচার করি বা অসমকাম-পিতৃতন্ত্র মুক্ত একটা সমাজের খোঁয়াব দেখি, যখন প্রচার করতে নামি মাঠে- ময়দানে, প্রাইড-প্যারেডে রামধনু ফুটিয়ে তুলি শুষ্ক শহরের পিছ-গলা রাস্তায়, প্রশ্ন সমাজের মনকে--- তাদেরই বা কি কি করার আছে সে সব প্রশ্নে। যখন একটা অংশ, তা সে ধর্মীয় গোঁড়াবাদই হোক বা ‘প্রগতিশীল যুক্তিবাদী’, নানা অপব্যাক্য্য সামাজিক সংস্কার সম্ভান-উৎপাদনের জন্য যৌনাচরণ কে দোহাই দিয়ে সমপ্রেমকে ‘মানসিক সমস্যা/বিকৃতি’ বলে প্রচার চালিয়ে যায় --- তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানসম্মত, প্রকৃত অর্থে প্রগতিশীল সমাজনীতি নির্মাণের জন্য সওয়াল আমাদেরও করতে হবে। বয়ঃসন্ধির পর থেকে যে ছাত্র বা ছাত্রী তাঁর যৌন পছন্দকে ‘স্বাভাবিক’ করতে পারছেন না, সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মাতে দেখছেন বা যাঁর মনে হচ্ছে যে তাঁর শরীর আর মনে এক ভয়ানক বৈপরীত্য বর্তমান, শারীরিক লিঙ্গটি তাঁর ‘ইচ্ছের’ লিঙ্গ নয়--- সেই সমস্ত ‘অ-স্বাভাবিক’ রা যখন পাঠ্যবই-এর ব্যাক্য্যয় নিজের এই ইচ্ছেগুলোকে মানসিক-জৈবিক সমস্যা বলে পড়েন, তখন তাঁর প্রত্যেকদিনের এই সমস্যার সমাধানটি কোন ডাক্তার করতে পারেন। যে পাঠ্যপুস্তক লক্ষণকে চিহ্নিত করে রোগ নির্ণয় করে দিচ্ছে, তার তো অবশ্যই উচিত পথ্যটিও বলে দেওয়া। প্রশ্ন হল, ‘সমস্যাজনক’ ছাত্রী বা ছাত্রটি যখন তার শিক্ষক-মশাই এর কাছে পথ্যটি চাইবেন, তাঁরা কি বলবেন! যদিও সেই শিক্ষক বা শিক্ষকা ব্যক্তিটি সমপ্রেমকে পুস্তক লেখকের মত একই ছাঁকনিতে মাপেন, তবে স্বাভাবিক পথ্য হিসেবে পর্ণগ্রাফি দেখার বা জোর করে অপর লিঙ্গের সাথে প্রেম-সেক্স করার সাজেসনই দিতে হয়। এভাবেই শুরুও হয় যৌনতার ক্ষমতা কাঠামোয় ‘সারভাইভাল অফ দা ফিটেস্টের খেলা’। ‘যো জিতা উওহি সিকন্দর’। আর হেরে গেলে, রেল লাইন-বহুতল বাড়ির ছাছ-সিলিং - ঘুমের বড়ির শিশিফলিডল, সমাজে হাজারো কিসিমের ব্যবস্থা আছে,-- খাপ ব্যবস্থা থাকলে তো কথাই নেই, সমাজই তার ‘সংশোধন’-এর দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারে। অথবা যারা এই দুয়ের কোনওটাই করতে চান না, তারা নিজের দায়িত্বে খুঁজে নিন নিজেদের একটি খোপ। বেঁচে বর্তে থাকুন সেই গর্তে, খিস্তি-খেউর-টোন-টিটকিরি-হেনস্থা-হয়রানি-অত্যাচার সহ্য করে। আপনার খোপের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছে।

কেন্দ্র যখন আছে তখন প্রান্তও থাকবে। যারা কেন্দ্রের আওতায় পড়বেন না বা কেন্দ্রের মোডাস-অপারেন্ডি দিয়ে যাদের ‘ম্যানেজ’ করা যাবেনা, তারা কেন্দ্রকে যাতে অস্থির করে ফেলতে না পারেন, সে জন্যই প্রান্তের জন্যেও কেন্দ্রের নিয়মকানু বলবৎ থাকবে। এমন ভাবেই রাখার চেষ্টা হবে যা নিয়ে প্রান্ত যেন ‘শান্ত’ থাকে। গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে, কিন্তু প্রান্তের মত। কেন্দ্র এবং প্রান্তের গণতন্ত্রে বোধের এবং অভ্যাসের মধ্যেও থাকবে আকাশপাতালের পার্থক্য। এই প্রান্ত আরো প্রান্তিক হবে যখন শুধু মাত্র তার ‘অন্য’ যৌনতা নয়, যুক্ত হবে অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা - নিচু জাতের প্রান্তিকতা ইত্যাদি। তাই প্রান্তের মধ্যেও ক্ষমতার পিরামিড ভালোমতেই থাকবে।

‘অধিকার’ যদি এই পিরামিড বেয়েই ওঠা-নামা করে, তাহলে স্বাভাবিক প্রান্তের ‘অদিকারবোধের’ কোন সাম্য নেই। শুধু মাত্র ‘অধিকার’ এর দাবি প্রান্তকে কেন্দ্রের দিকে খানিক এগোতে পারে বটে, কেন্দ্র প্রান্তের জ্যামিতি তাতে একটুও বদলায় না। কেন্দ্র কেন্দ্রের মতই ‘সুস্থির’ থাকতে পারে, প্রান্ত কেন্দ্রের অধীনে ‘শান্ত’।

পাঠক হয়তো খানিক বিব্রত। সমাজতত্ত্ব বই-রে উদাহরণ দিয়ে যে লেখা শুরু হয়েছিল তা কেন হঠাৎ কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের মধ্যে এসে পড়ল! এসে

পড়ায় নিশ্চই লেখক হিসেবে আমার দায় আছে, আবার পরিস্থিতির গতিও আছে বটে, এবার আপনি ভাবুন আরো একটু তলিয়ে। যদি ঐ বইটিতে এরকম কিছু লেখা থাকত, যেটাই মূলত অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষজনের প্রকাশ্য অথবা আড়ালের বক্তব্য, যে--- “সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ‘এরকম’ হন, না না বিকৃতির কারণে নয়। তবে ঐ আর কি ব্যতিক্রম মানে এক্সসেপ্‌সন তো থাকে। যাই হোক না কেন। মানুষ হিসেবে এঁদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে, প্রেম বেছে নেবার অধিকার আছে, যৌন সম্পর্ক নির্ধারণের স্বাধীনতা আছে ... তাতে খামোখা কেন রাষ্ট্র নাক গলাবে... মূল স্রোতের নাই হতে পারে... তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে...”। ভেবে দেখুন বন্ধু, গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে এভাবেও সওয়াল করা যায়, কিন্তু এর মধ্যের রাজনীতিটি তৈরিই হয় সমপ্রেমী-রূপান্তরকামী-হিজড়ে মানুষদের প্রান্তিক ধরে নিয়ে। নিয়মের ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে। যেখানে ক্রিয়াশীল নিয়মটি হল অসমকাম-পিতৃতন্ত্র বা বলা ভালো হেটেরোনর্ম্যাটিভ। এই নীতিমানতন্ত্রই কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসরে। রাস্তায় অধিকারের দাবীতে মুখরিত হলেও তথাকথিত কেন্দ্রের কাছাকাছির বাসিন্দারা মনের ভিতরে সযত্নে লালন এবং অসংখ্য মানুষের মনে ক্রম-প্রতিপালন করবেন সমপ্রেমভীতি (হোমোফোরিয়া) - রূপান্তরকামীভীতি (ট্রান্সফোবিয়া) ইত্যাদি। নিজের মেয়েলি ছেলে অথবা ছেলেলি মেয়ে কিংবা সমলিঙ্গে ভালোবাসতে চাওয়া সম্ভানের ওপর নামিয়ে আনবেন হেটেরোনর্ম্যাটিভ সিলেবাসের ‘কি করে সংবেদনশীল হেটেরো হওয়া যায়’।

না, আমি অপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক অধিকার গুলোর বা অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের বিপক্ষে কথা বলছি না। যা প্রতিটি মানুষের হক্‌ টা দরকারে ছিনিয়ে নিতে হবে। আমি অধিকার রাজনীতিকে হেটেরোনর্ম্যাটিভ কাঠামোর মধ্যে থেকে বুঝতে চেয়েছি মাত্র। বুঝতে চেয়েছি, কারণ এই অধিকার রাজনীতি অসাড় হয়ে পড়তে পারে যদি না সে হেটেরোনর্ম্যাটিভ কাঠামোকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে। পণ্য বিক্রির চক্রান্ত - মিডিয়ার নিউজ ভ্যালু টপকে কাঠামো অক্ষুণ্য রাখার যাবতীয় প্যাঁচপয়জারের মুখের ওপর আজ অবিশ্রাম রামধনু মিছিলের প্রয়োজন... রাস্তায়-গ্রামেগঞ্জে-স্কুল কলেজে-গবেষণাগারের ভিতরে। একদিকে যখন একদল ব্যবসায়ী সমপ্রেম-এর জন্য জিনকে দায়ী করে সাজানোর চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানের যুক্তি-প্রযুক্তি, তার উল্টোদিকে শুধুমাত্র সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব চিৎকার করে হেঁকে যাওয়াটাই কাজ নয়। কাঠামো ভাঙতে তা যথেষ্ট নয়ও। বিজ্ঞানের অপ-ব্যাক্য্যর জবাব বিজ্ঞান দিয়েও দিতে হবে। কেন্দ্র-প্রান্তকে টিকিয়ে রাখতে চাওয়া যাবতীয় নির্দেশ্যবাদী দর্শন-রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত মুক্তির খোঁয়াবনামা লিখে যেতে হবে দেওয়ালে দেওয়ালে- লিফলেটে-ফোল্ডারে-লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়-গানের কথায় সুরে-ক্যানভাসে- স্থাপত্যে ভাস্কর্যে- সেলুলয়েডের সাত লক্ষ রঙের রামধনুতে। হাজারো যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে আমাদের, আমাদের মধ্যে। আমাদের মানে সমাজের প্রতিটি আম-জনতার মধ্যে। হেটেরো-হোমো, সোজা-বঁাকা ইত্যাদি যাবতীয় ভূয়ো বিভাজনের পর্দার আড়াল সরিয়ে হাজারো সংলাপ চালাতে হবে। প্রত্যেক দিন প্রতি মুহূর্তে। প্রত্যেক দিন ধেয়ে আসা প্রতিটি হেনস্থা-টিটকিরিতে শুধু বিরক্ত না হয়ে পাল্টা আলাপ জমাতে হবে। কথা বলতে হবে তাঁদের সঙ্গে যাঁরা ‘আওয়াজ’ দিচ্ছেন। আমাদের রাগ-বিরক্তি আমাদের যেন একলা করে না দেয়, বরং তা আমাদের আরো শক্তি দিক সমাজের সাথে সংলাপ চালাতে। হতেই তো পারে, যে ব্যক্তি আজ নিজেকে ‘হেটেরো’ মনে করে কোন রূপান্তরকামী অথবা হিজড়া মানুষের দিতে ছুঁড়ে দিচ্ছেন টিটকিরি, তিনিই হয়তো জীবনের কোন একসময়ে তাঁর শরীর-মনের ‘অন্য’ কিছু হতে চাওয়ার ডাক অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন এই সমাজেরই চাপে! আজ যদি তাঁর এই হোমোফোবিয়া কে অগ্রাহ্য করে রেগে এড়িয়ে না গিয়ে তাঁর সাথে গল্প করতে এগিয়ে আসি। যদি ‘অন্য’ যৌনতার মানুষদের যাপনচিত্র বন্দুর মত করে তুলে ধরতে পারি... তাহলে কি বদলাবে না সেই মানুষের ভাবনাগুলো! হাজার হোক মানুষতো, অসংখ্য না-পাওয়া নিয়ে দিন গুজরানো একজন আম-পাবলিক। যে অধিকারের জন্য সব হতে হচ্ছে আজ হাজারো ‘প্রান্তিক’ মানুষকে, সেই অধিকার যদি আইনি ভাবে মিলেও যায়, তবুও কি আসলে তা পাওয়া যাবে, যদি না সমাজ স্বীকৃতি দেয়? হকের দাবীতে সমবেত হওয়া রামধনু-মিছিল ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, সকল প্রানের অশ্বেষণে। “...এই -যে বিপুল ডেউ লেগেছে তোর মাঝেতে উঠুক নেচে, সকল পরান দিক-না নাড়া।।”

কেন্দ্র সর্বদাই ঠুনকো... এক মহান তাত্ত্বিক এর বিষদ ব্যাক্য্যও দিয়েছেন নাকি...। প্রান্ত আছে, তাই তার সাপেক্ষে কেন্দ্রও জ্বলজ্বল করছে। ‘প্রান্ত’-র ক্রমামত চাপবৃদ্ধি, কেন্দ্রকে অতিষ্ঠ করার নাছোড় প্রচেষ্টা একদিন এই সাপেক্ষতার জ্যামিতিকে বদলে দিতে পারবে। আমাদের খোঁয়াব যৌন হিংসাহীন এক দুনিয়া - যাবতীয় অবরোধ মুক্ত লিঙ্গসাম্যের এক ভোর... আর আমাদের বিশ্বাস, এটা সম্ভব হবে একদিন সব মানুষের চেষ্টায়... এটাতো মানুষেরই ইতিহাস... আসুন, কেন্দ্র-প্রান্তের বাইরে যাই...